Titir – Prabondho – Other – Guru – Sishya Upakatha – Ranjit Kumar Mitra
তিতির - গুরু - শিষ্য উপকথা - রনজিৎ কুমার মিত্র

ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় লিখিত সাহিত্য নিয়ে এমন একটি সাহিত্য সমগ্র গড়ে উঠেছে, যাকে ভারতীয় সাহিত্য বলা চলে। এই ভারতীয় সাহিত্যের উপন্যাসের ইতিবৃত্তে দুটি স্মরণীয় নাম সতীনাথ ভাদুড়ী ও ফণীশ্বর নাথ রেণু। এঁরা দুজনেই বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মানুষ ছিলেন। দুজনেরই ছিল রাজনীতির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক। 'গুরু-শিষ্য'র সম্পর্কের নৈকট্যে আবদ্ধ এই দুটি মানুষ একই সাথের একই দলের রাজনীতিতে ও বহুদিন জড়িয়ে ছিলেন। ১৯৪২-এ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলে দুজনেই আড়াই থেকে তিনবছর ছিলেন। সেই সময়েই সতীনাথ তাঁর 'জাগরী' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছিলেন, যেখানে রেণুজী হন এই উপন্যাসের প্রথম পাঠক। স্মৃতিকথাতে রেণুজী তাঁর এই অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন খুব সুন্দর করে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর জন্ম ১৯০৬, আর ফণীশ্বর নাথ রেণুর ১৯২১-এ। দুজনের মধ্যে বয়সের তফাৎ প্রায় পনের বছরের। সতীনাথের আবাস পূর্ণিয়ায় সদরে ভাট্টাবাজারে আর রেণুর আবাস পূর্ণিয়ার ফরবেশ গঞ্জ থেকে দশ কিলোমিটার দূরে ওরাহীহিংনা গ্রামে। সতীনাথের বাবা ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী ছিলেন পূর্ণিয়ার প্রখ্যাত আইনজীবি। ওরাহীহিংনার সম্পন্ন জোতদার শীলানাথ মণ্ডলকে জমি - জমা মামলা মোকদ্দমার কাজে প্রায়ই ভাট্টাবাজারে 'ইন্দবাবুর কোঠী'তে আসতে হত। এই রকমই এক যাতায়াতে একবার দশ-এগারো বছরের ছেলে রেণুকে শহরের ডাক্তার দেখাবার জন্য নিয়ে এসে রেণুকে ইন্দুবাবুর কোঠীতে নিয়ে যান। সতীনাথ তাকে নিজের কাছে রেখে দেন, তাঁর রাশভারী বাবা ছোটছেলেদের মামলা - মকদ্দমার কাজের সময় নিয়ে আসা একদম পছন্দ করতেন না। বাবার কাছ থেকে রেণু ছোটবাবুর অনেক গল্প শুনেছিলেন। এবার তার কাছে এলেন। সেই শুরু তারপর তাদের বহুবার দেখা হয়েছে নিকট সম্পর্ক তৈরী হয়েছে। একই রাজনীতিতে যোগ দিয়ে দুজনে একসাথে ঘুরেছেন পূর্ণিয়ার বহু অঞ্চল। একই অঞ্চল ও তার মানুষ জনদের কথা বলেছেন দুজন তাদের কথা সাহিত্যে।

পূর্নিয়াতে 'বঙ্গসাহিত্য - সংস্কৃতির সুগভীর প্রভাব ছিল'। ১৯১২ সাল থেকে বিহার আলাদা প্রদেশ হিসেবে গঠিত হয়। তার আগে একই প্রেসিডেন্সী অব - বেঙ্গল এর অধীনে ছিল বিহার আর বাংলা। পূর্ণিয়াকে এক সময় 'বিহারের বাংলা' বলা হত। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালীরা বিহারে চাকরী ক্ষেত্রে বিশেষতঃ শিক্ষকতা, ওকালতি, চিকিৎসা পেশায় প্রধান্য অর্জন করেছিলেন। ফণীশ্বর নাথ রেণু এই 'বাঙালী রাজ' এর বর্ণনা দিয়েছেন বহুবার বহু লেখাতে। তাঁর 'পল্ট বাবু রোড' উপন্যাস থেকে কয়েক লাইন ... /আজ সে সত্তর অস্সীসাল পহলে, ইন ইলাকো পর বঙ্গালিয়োকা রাজ থা। হাকিম - হুক্কাম, ডাক্টর - মাস্টার - ওকীল- দুকানদার - ব্যবসায়ী, স্টেশন মাষ্টার সে লেবার ডাকবাবু- সভী বাঙ্গালি। জিলেকে সভী সব-ডিবিজন পর বাঙ্গালি শাসন। ইস ইলাকাকে লোগ বঙ্গালিয়োকে গোরী চমড়ী বালেআংগ্রেজো সে এক দর্জহী কম সমঝতে থে।*শুধু শহরে নয় পল্লী গ্রামেও ছিল তার প্রভাব তবে তা ইংরেজি শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত নব্য বাঙালীর নয়, সনাতন বাঙালীর। রেণু বাংলার লিখেছিলেন - /আজ থেকে ত্রিশ - চল্লিশ বছর আগে পর্যন্ত পূর্ণিয়া জেলার গ্রাম সমাজের সাধারণ গৃহস্থের নিজের ঘরে বাংলা শিশুবোধ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরাম দাসী মহাভারত এবং বাংলা পঞ্জিকা রাখা অতি আবশ্যক মনে করতেন, পড়ুয়া ছেলেদের প্রশ্ন করা হতো- বাংলা রামায়ণ - মহাভারত পড়তে পারে?* শৈশব ও কৈশোর থে কে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সান্নিধ্য তাঁর মধ্যে গভীর ছাপ ফেলেছিল। বাংলা হয়েছিল তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভাষা। আমৃত্যু বাংলা সাহিত্য - সংস্কৃতির জগতে তিনি যাতায়াত করেছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে কৃত্তিবাস পত্রিকা সবকিছুতেই আগ্রহ ছিল তার। 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ', 'শনিবারের চিঠি' কল্লোল ইত্যাদি পত্রিকার সাথে তাঁর পরিচয় ছিল। যুবাবস্থায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাইকমল' ছিল তাঁর প্রিয় উপন্যাস। কাশী বিদ্যাপীঠের ছাত্র থাকাকালীন কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা হিন্দীতে অনুবাদ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র, জীবনানন্দ, পরশুরাম, সৈয়দ মুজতবা আলী, স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সবাই আছেন তাঁর রচনায়। ১৯৬৫ তে বেনারস থেকে রাজকমল চৌধুরী 'মরাল' পত্রিকার 'বাংলা নবলেখন বিশেষাঙ্ক' তে তিনি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, জ্যোতির্ময় দত্ত, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার প্রমুখর প্রোফাইল রচনা করেন।

বাংলা সাহিত্য পড়তে ও বুঝতে পারেন এমন হিন্দী সাহিত্যিকের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু ফণীশ্বর নাথ রেণুর বাংলাভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আবেগ ছিল এমন যা খুব বেশী দেখা যায় না। হিন্দী সাহিত্যিক ও সমালোচক মন্মথ নাথ গুপ্ত যথার্থই লিখেছেন - /উহ বস্তুত বঙ্গালি হ্যায়, পৈদা কহী ভী হুএ হো* । 'সাহিত্যিক শিষ্য' ফণীশ্বর নাথের প্রতি সতীনাথের অপরিসীম স্নেহ ছিল। গুরু সতীনাথ 'এর প্রতি ফণীশ্বর নাথের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার মনোভাব আমৃত্যু অক্ষুন্ন ছিল। সুবল গঙ্গে ফণীশ্বর নাথ রেণু লিখিত রচনা 'ভাদুড়ীজী' অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। সতীনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে কৌতুহলী পাঠকদের অবশ্যই পাঠ্য এই রচনা।

সতীনাথ যেমন বাংলা কথা সাহিত্যে বহু উচ্চারিত নাম, তেমনি হিন্দীকথা সাহিত্যে ফণীশ্বর নাথ রেণু। সতীনাথ ও রেণুর উপন্যাস দুটির একযোগে আলোচিত হবার প্রধান কারণগুলি হল, দুটি উপন্যাসেরই লেখক এক অঞ্চলের আধিবাসী। একই পারিপার্শ্বিক জগৎ, অভিজ্ঞতা দুজনের রচনায় সহায়তা করেছে। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' ও 'ময়লা আঁচল' এ -একই অঞ্চলের, একই কালের বর্ণনা আছে। দুটি উপন্যাসের নর - নারীর আচরণেও অনেক সাদৃশ্য। দুজনেই উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। দুজনের উপন্যাস রচনার লক্ষ্য আপাত দৃষ্টিতে এক বলে মনে হয়। দুজনেই উপন্যাসের মধ্যে ধরতে চেয়েছিলেন পরিবর্তমান ভারতবর্ষের ছবি। রেণু পূর্ণিয়া জেলার একটি অনগ্রসর গ্রামকে পল্লী ভারতের প্রতিচ্ছবি হিসেবে উপন্যাসের আখ্যানভূমি বেছে নিয়েছেন। সতীনাথ চেয়েছিলেন - /ইচ্ছা ছিল আমার জ্ঞানে গ্রামের নিরক্ষর সাধারণ লোকের মন কিভাবে বদলাতে দেখেছি, কেমন ভাবে তারা - ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে মানুষ হিসেবে নিজেদের অধিকার বুঝে নিচ্ছে তাই নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখব।* সতীনাথ ঐ ইচ্ছা থেকেই তাঁর চেনা ঢোড়াই কে এমন ভাবে বদলে ছিলেন যাতে সে সারা দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। 'ময়লা আঁচল' এ রেণু চরিত্রগুলো এমনভাবে সাজিয়ে ছিলেন যে তারা পল্লী ভারতের অতি সাধারণ মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। স্থানীয় রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা দুজনের উপন্যাসেই প্রতিফলিত। দুজনেই গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উপন্যাসোপযোগী পটভূমি ও পরিবেশের সন্ধান পান। সেই সঙ্গে উপজীব্য চরিত্র ও ঘটনা। দুজনেরই রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে বিহারের লোকজীবনের গোটা প্রকরণটাই ছিল আয়ত্তে।

'ময়লা আঁচল' ও 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' দুটি উপন্যাসে লেখকদ্বয় ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমান আগ্রহ দেখিয়েছেন। শুধু উপভাষা বা গ্রামের কথ্য ভাষা নয়, চরিত্রানুগ ভাষা, বর্ণনার প্রয়োজনে নতুন শব্দসৃষ্টি, ভাষা মিশ্রণ ইত্যাদি। সতীনাথ যেমন তাঁর বাংলা উপন্যাসে হিন্দি শব্দ, বাক্য ব্যবহার করেছেন, রেণুও তাঁর উপন্যাসে বাংলা শব্দ, বাক্য ব্যবহার করেছেন। পূর্ণিয়ার বিহারী - বাঙালি মিশ্র সংস্কৃতির কথা এই দুটি উপন্যাস বার বার স্মরণ করায়। উত্তর বিহারের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনচর্যা, স্থানীয় ঐতিহ্য ও সামাজিক গতি - প্রকৃতি, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, সাংস্কৃতিক - ধর্মীয় অনুষ্ঠান - এই রকম বহু বিষয়কে দেশ কাল মানুষের এই বিরাট প্রেক্ষাপটকে উপন্যাসের আকারে শিল্পসম্মত করা নিঃসন্দেহে দুরূহ কাজ। সতীনাথ বাদুড়ী ও ফণীশ্বর নাথ রেণু তাঁদের উপন্যাসে এই কাজটি করেছিলেন। এই দুটি উপন্যাসের মধ্যেই ভারতবর্ষের বিশাল জনগণের একজনকে দেশের প্রগতিচেতনার বাহন করে তোলার পরিকল্পনা লক্ষনীয়। দুজন সৎ ও সময় সচেতন লেখক নিজের নিজের মাতৃভাষায় লিখেছেন সময়ের উপকথা। এই দুজনের যোগাযোগ প্রসঙ্গ বাংলা সাহিত্যে তেমন আলোচিত না হলেও হিন্দি সাহিত্যে বহু আলোচিত। এই দুই গুরু-শিষ্যর দুটি উপন্যাস /ঢোঁড়াই চরিত মানস* ও /ময়লা আঁচল' কে নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। সেই সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছিল 'ময়লা আঁচল* উপন্যাস টি কি /ঢোঁড়াই চরিত মানসের' অনুবাদ ? 'ময়লা আঁচল' প্রকাশের সাথে সাথেই ফণীশ্বর নাথ রেণুর একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের প্রশংসা অর্জন অনেকের কাছেই ঈর্ষার কারণ হয়েছিল। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' ও 'ময়লা আঁচল' নিয়ে যে তর্ক বিতর্ক হচ্ছিল তাতে অনেক সময়ই দুটি উপন্যাসের আলোচনা অন্তর্হিত হয়ে ব্যক্তিগত কুৎসা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। অনেকেই রেণুর মৌলিক প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠা বোধ করেছিলেন। এঁরা 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' ও'ময়লা আঁচল' এর কোন তুলনামূলক আলোচনা না করে 'নকল', 'অপহরণ' ইত্যাদি বলে সোরগোল তুলেছিলেন।

রেণুর সাহিত্যিক জীবন বিকাশে সতীনাথের সস্নেহ প্রশ্রয় ছিল। সতীনাথই ছিলেন তাঁর উপন্যাস রচনার প্রেরণা। ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলে সতীনাথের সান্নিধ্য রেণুকে ভীষণ আলোড়িত করেছিল। 'জাগরী'র মত 'ময়লা আঁচল' রচনার সূত্রপাত ও ঐ জেল থেকেই। তবে 'ময়লা আঁচল' প্রকাশিত হয়েছিল অনেক পরে। রেণুর 'ময়লা আঁচল' লেখা শেষ হবার পর সতীনাথ নিজে কলকাতার চিত্রশিল্পী আশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন বইটির প্রচ্ছদ করে দেবার জন্য। 'ময়লা আঁচল' প্রকাশিত হবার পর সতীনাথ খুব খুশী হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে রেণু লিখেছেন - /বই পেয়ে এত খুসী হয়েছিলেন যে কথা বলতে বলতে সেদিন ওর চোখের পাতা ভিজে গিয়েছিল। আমার বই প্রশংসা অর্জন করেছে শুনে আরও প্রসন্ন হয়ে আমাকে বার বার 'সাব্বাশ' বলতেন। এমন সময় একদল স্থানীয় লেখক রটিয়েছিল যে, 'ময়লা আঁচল' ভাদুড়ীজীর বই 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' এর অনুবাদ।*

সতীনাথকেও মাঝে মাঝে এই প্রসঙ্গে বিব্রত হতে হতে, অনেকেই তাঁকে প্রশ্ন করতেন 'ময়লা আঁচল' 'ঢোঁড়াই চরিত মানসের' নকল কিনা ? মিতবাক সতীনাথ এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত কিছু বলতেন না। ময়লা আঁচলের প্রকাশক ওমপ্রকাশজি এই প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি লিখেছিলেন 'রেণুর ময়লা আঁচুল আমার ঢোঁড়াই চরিতের অনুবাদ বা চুরি নয়। আশাকরি হিন্দী লেখকদের মধ্যে ভাল বাংলা জানেন এমন লোক নিশ্চয়ই আছেন। ওঁদের পড়িয়ে জানতে পারবেন যে অভিযোগটা কত মিথ্যা'। এই দুই কথা সাহিত্যিকতাঁদের নিজেদের রচনায় এমন কিছু

সমকালীন প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন যা একই অঞ্চলের আধিবাসী দুই ভিন্ন ভাষার লেখক নয়, ভারতবর্ষের যেকোন অঞ্চলের যেকোন লেখকই তুলে আনতে পারেন।

ফণীশ্বর নাথ রেণুকে অনেকেই সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্যিক উত্তরপুরুষ বলেছেন। এই বিশেষণে রেণুকে বিশেষিত করবার কারণেও ঢোঁড়াই চরিত মানসের সঙ্গে ময়লা আঁচলের সংযোগ উপলব্ধি করা যায়। সতীনাথ ভেবেছিলেন ঢোঁড়াই চরিত মানসের তৃতীয় রচনা লিখবেন। তাঁর নামও ভেবে রেখেছিলেন 'উত্তর ঢোঁড়াই চরিত'। সতীনাথের অগ্রজ ভূতনাথ ভাদুড়ীর কাছ থেকে সেই না লেখা উপন্যাসের বিষয় জানা যায়। সতীনাথের এই পরিকল্পনার কথা ও শিষ্য ফণীশ্বরনাথ জানতেন। সতীনাথ নিজে ১৯৪৭-এর পর আর রাজনীতিতে থাকেননি।

সতীনাথের রাজনৈতিক জীবনের ব্যাপ্তি নয় বছর (১৯৩৯ - ৪৮)। সতীনাথ পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারী হয়েছিলেন (১৯৪১)। দেশ স্বাধীন হবার পর কংগ্রেস আদর্শভ্রষ্ট হয়েছে অনুভব করে তিনি কংগ্রেস ছাড়েন। ফণীশ্বর নাথের লেখা থেকেই জানা যায় একজন পুরানো রাজনৈতিক কর্মী জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'কেন ভাদুড়ীজী কংগ্রেস ছেড়ে দিচ্ছেন?' সতীনাথ হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, সে কাজ তো হাসিল হয়ে গেছে। এখন 'রাজকাজ' ছাড়া কোন কাজ নেই আর।' এর মাস চারেক পরে তিনি সোসালিস্ট পার্টিতে যোগ দেন, কিন্তু সেখানেও কিষাণ মজদুর সমস্যা নিয়ে এত সক্রিয় হয়ে ওঠেন যে দলের ধনী সদস্যরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই সোস্যালিস্ট পার্টি ত্যাগ করেন। বাকী জীবনটুকুতে বেছে নেন সাহিত্যের পথ। সতীনাথ যখন কংগ্রেস ত্যাগ করেন সোসালিস্ট পার্টিতে যোগ দেন রেণুও তখন সেই দলে যোগ দিয়েছেন। তিনি ছিলেন সতীনাথের সোস্যালিষ্ট পার্টির সভ্যপদের প্রস্তাবক। সতীনাথের রাজনীতি ছেড়ে দেওয়া রেণুর মনকেও গভীর ভাবে আলোড়িত করেছিল।

'ঢোঁড়াই চরিত মানস' ও 'ময়লা আঁচল' দুটি উপন্যাসই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতারও রূপান্তরের তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস। কালগত দিক থেকে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' যেখানে শেষ হয়েছে, 'ময়লা আঁচল' সেখান থেকে শুরু। সতীনাথ ত্রিশ সাল থেকে দশ - বারো বছর ধরে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তাকে অবলম্বন করেই তাঁর পক্ষে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' লেখা সম্ভম হয়েছিল। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' এর লাডলীবাবুরা ক্ষমতাসীন হবার পর গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য, বঞ্চনা যেভাবে তীব্রতর হয়েছিল সেই চেহারার স্পষ্ট রূপ পেতে বছর দশেকের সময় লেগেছে। সতীনাথের হাতে সময় ছিলনা এই পরিবর্তনকে খানিকটা সময়গত দূরত্বের নিরাসক্তি দিয়ে তাকে রূপায়িত করা। সতীনাথের যারা সাহিত্যিক উত্তরপুরুষ তাঁদেরই দায়িত্ব ছিল সেই 'উত্তর ঢোঁড়াই চরিত' বা 'উত্তরোত্তর ঢোঁড়াই চরিত' রচনার। গুরুজী প্রদর্শিত পথ হয়তো শিষ্য রেণুকে আলোড়িত করেছিল, তাঁকে এই বিষয়ে লিখবার প্রেরণা দিয়েছিল। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' -এর দ্বিতীয় চরণ পর্যন্ত যে সামাজিক বাস্তবতা ও পরিবর্তনের ছবি সতীনাথ এঁকেছিলেন রেণু সেই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন 'ময়লা আঁচলে'। যে ভারতীয় বাস্তবতা' 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' কে বিশিষ্ট করেছে তার উত্তরাধিকারের অভিজ্ঞান আমরা 'ময়লা আঁচল' এ পাই।

সতীনাথ ও রেণু দুজনেই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' ও 'ময়লা আঁচল' এ ভারতবর্ষ, বিহার তথা পূর্ণিয়ার মানুষের জীবনের যে বিশ্বস্ত ছবি পাই তা ঐ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে আহরিত। স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনীতির কুৎসিত ছবি রেণু একাধিক বার অনাবৃত করেছেন তাঁর রচনায়। ভারতসরকারের কাছ থেকে পাওয়া 'পদ্মশ্রী' এবং বিহার সরকারের কাছ থেকে পাওয়া ভাতা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

সাহিত্যিক - সমালোচক - বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গোপাল হালদার মন্তব্য করেছিলেন - 'সতীনাথ বুঝেছিলেন গান্ধী আন্দোলনের উত্তর পুরুষ নেই তাই প্রস্তাবিত উত্তর ঢোঁড়াই চরিত' লেখা হয়নি। কিন্তু রেণুর 'ময়লা আঁচল' পড়লে মনে হয়, প্রশ্ন জাগে? সতীনাথ 'ঢোঁড়াই' এর যে বিবর্তন দেখালেন 'তাঁর ভবিষ্যৎ বিকাশ গান্ধী আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে কেন?' রেণুর ময়লা আঁচলে এক কালীচরণ, বিরসা মাঝির জমি দখলের লড়াইতে লেখা হয়ে যায় 'উত্তর ঢোঁড়াই চরিত'। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' ও 'ময়লা আঁচল' উপন্যাস দুটি এক গভীর সম্পর্ক সূত্রে বাঁধা। বাংলা ও হিন্দী ভাষায় এই দুটি উপন্যাসের পাশাপাশি অবস্থান, ভারতীয় কথা সাহিত্য, ভারতীয় বাস্তবতার যথার্থ নিদর্শন।

Titir – Kabita – Short – Fera – Samar Das

তিতির - ফেরা - সমর দাস

দাঁড়ের টানে সামনে যতই এগোই
পিছনে পড়ে অসীম নীরবতা,
বুকে ও নীচে শব্দ ওঠে ছলাৎ
নীরবে ওড়ে পালের
সাদা কেতন।

অনেকদিন ছেড়েছি পরিপাটি
অপরিচিত স্বজন ঘেঁষা চর
দুপুর - রাতে প্রায়শ ভেসে ওঠে
পাষাণ দেব, হিমালয়ের যোগী।

কোথাও তবু এখনো কিছু আছে
উথলে ওঠে ইচ্ছে ঘরে ফেরার
যদিও দেখি নদীর মৃত চরে
বুকে ও নীচে শব্দ ওঠে ছলাৎ।